Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-IV, July 2021, Page No.124-132
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মহাভারত ও সাংখ্যকারিকার নিরিখে প্রকৃতি – একটি সমীক্ষা

মণিমালা মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, গুসকরা মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
The Mahābhārata is one of those Smṛti texts that have a lot of material on Indian śāstras along with which is morals and teachings associated with the Indian schools of philosophy. Throughout the vast expanse of the text Vedānta and other schools of philosophy are represented but arguably the most importance has been accorded to the Sāṃkhya system. Of the 25 Sāṃkhya tattvas the prakṛtitattva has featured prominently in the Mahābhārata and has gotten treatment which is unique to the grand epic. The prakṛtitattva has received its proper and elaborate treatment in Īśvarakṛśṇa's Sāṃkhyakārika and this opens the arena for a comparative analysis of the tattva in terms of their treatment in the Mahābhārata and the Sāṃkhyakārika. What emerges is that the principle has been handled almost similarly except for the introduction of the concept of Īśvara in the Mahābhārata which sits atop prakṛti and controls its actions, while in the Sāṃkhyakārika it is completely independent.

Keywords: Mahābhārata, Sāṃkhyakārika, prakṛti, avyakta, guṇa

মহাভারত ভারত-ইতিহাসের পুর্ণাঙ্গ দলিল। মহাভারতের সমগ্র সাহিত্য কাঠামোয় প্রলিপ্ত হয়ে আছে ভারত সভ্যতার সর্বাঙ্গীন ইতিহাস। আলংকারিক বিচারে মহাভারত মহাকাব্যের সংজ্ঞায় বিভূষিত হলেও মূলত এটি একটি সংকলন গ্রন্থ। ভারতীয় বিদ্যার এমন কোন ক্ষেত্র নেই যা মহাভারতের দ্বারা স্পৃষ্ট হয়নি। তাই মহাভারতের মহাত্ম্য কীর্তন করতে গিয়ে নির্দিদ্ধায় উচ্চারিত হয় – যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ। অর্থাৎ যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে। মহাভারতকে আমরা যেভাবেই অন্বেষণ করি সে সেইভাবেই ধরা দেয়। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে মহাভারত হল একই আধারে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীন ইতিহাস, সম্পূর্ণ সাহিত্য, সামগ্রিক সমাজবিদ্যা ও পরিপূর্ণ নীতিবিদ্যা ও পূর্ণ দর্শন।

আঠারোটি পর্বের সমন্বয়ে গঠিত বিপুলাকার শরীরে মহাভারত অন্যান্য বিবিধ বিষয়ের ন্যায় ভারতীয় দর্শন চিন্তাকেও ধারণ করেছে ও তাকে বহন করে নিয়ে চলেছে। মহাভারতের সমগ্র আয়তনের বিভিন্ন অংশে যে দর্শনভাবনাগুলি প্রস্ফুটিত হয়েছে তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে এগুলি সবই ছয়টি আস্তিক দর্শনের কোন না কোন নীতির চিন্তাপ্রসূত। অর্থাৎ মহাভারতের সমগ্র দর্শনচিন্তা প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ষড়দর্শনেরই চিন্তা। এই ছয়টি দর্শনের মধ্যে আবার বিশেষ মাত্রায় প্রাধান্য পেয়েছে

সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন। বলা বাহুল্য সাংখ্যীয় ভাবনার প্রভাব বেদান্ত অপেক্ষা অধিকমাত্রায় প্রকটিত। অপরদিকে বর্তমানে প্রাপ্ত সাংখ্যদর্শনের একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা এই উভয় গ্রন্থেই সাংখ্যদর্শনের তত্ত্বসমূহ পূর্ণাঙ্গরূপে আলোচিত হয়েছে। তাই আমার বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হল মহাভারত ও সাংখ্যকারিকার আলোকে প্রকৃতিতত্ত্ব বিচার।

প্রচলিত সাংখ্যগ্রন্থগুলিতে যেভাবে প্রকৃতির আপাত পরিচয় দেওয়া হয়েছে, মহাভারতে তার থেকে একটু ভিন্নভাবে দেওয়া হয়েছে তবে অবশ্যই 'প্রকৃতি' শব্দটি উভয়ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত একই অর্থের বাহক। যেমন সাংখ্যকারিকায় প্রকৃতির প্রধান ও অব্যক্ত এই অপর দুটি নাম পাই। কিন্তু মহাভারতে প্রকৃতিকে উক্ত দুটি নাম ছাড়াও অন্যান্য অনেক নামে অভিহিত করা হয়েছে। সেগুলি হল তম, অব্যক্ত, শিব, ধাম, রজঃ, যোনি, সনাতন, প্রকৃতি-বিকার, প্রলয়, প্রধান, প্রভব, অন্যায়, অনুদ্রিক্ত, অন্যূন, অকম্প, অচল, ধ্রুব, সৎ, অসৎ, সর্ব, অব্যক্ত এবং ত্রিগুণ -

তমোঽব্যক্তং শিবং ধাম রজো যোনিঃ সনাতনঃ।
প্রকৃতি-বিকারঃ প্রলয়ঃ প্রাধানং প্রভবাপ্যয়ৌ।।
অনুদ্রিক্তমন্যূনং বাপ্যকম্পমচলং ধ্রুবম্।
সদসচ্চৈব তৎ সর্বমব্যক্তং ত্রিগুণং স্মৃতম।।
জ্ঞেয়ানি নামধেয়ানি নরৈরধ্যাত্মচিন্তকৈঃ।।[1]

প্রকৃতির নামরূপে ব্যবহৃত শব্দগুলির অক্ষরের পৌর্বাপর্ব বা বিন্যাসক্রম ভিন্ন হলেও অর্থগত ঐক্য থাকায় এরা প্রকৃতির পর্যায়শব্দ বা সমার্থকশব্দ। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তার ভারতকৌমুদী টীকায় প্রতিটি শব্দের সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যেখানে দেখা যায় যে প্রতিটি শব্দই প্রকৃতিধর্মকেই সূচিত করেছে। তাঁর ব্যাখ্যানুসারে প্রকৃতি তথা মায়া জ্ঞানের দৃষ্টিপথকে নিরুদ্ধ করে বলে 'তমঃ', স্বভাবতই অস্পষ্ট বলে 'অব্যক্ত', তার স্বরূপ জ্ঞাত হলে জীবের চরম মঙ্গল সাধিত হয় বলে 'শিব', জীবকে রঞ্জিত করে বলে 'রজঃ', জগৎ প্রপঞ্চের মূল হওয়ায় 'যোনি', নিত্য বলে 'সনাতন', প্রকৃষ্টরূপে কার্য সম্পাদন করে বলে 'প্রকৃতি', প্রকৃতির বিকার মহদাদি তত্ত্বসমূহ প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয় বলে 'বিকার', মহাপ্রলয়ের সময় সৃষ্টি প্রকৃতিতেই লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ প্রকৃতি লয়ের প্রকৃষ্ট আধার হয় বলে প্রকৃতি 'প্রলয়', প্রকৃষ্টরূপে সমগ্র সৃষ্টিকে ধারণ করে বলে 'প্রধান', মহদাদি তত্ত্বসমূহের উৎপত্তি স্থল হওয়ায় 'প্রভব' এবং লয়স্থান হওয়ায় 'অপ্যয়', গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা হওয়ায় 'অনুদ্রিক্ত', মহদাদি সমস্ত তত্ত্বগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রকৃতি থেকে জাত হওয়ায় সকলের জননী স্বরূপা এবং সকল তত্ত্বের উপরে অবস্থিত হওয়ায় সর্বাধিক, তাই 'অন্যূন', সৃষ্টির পূর্বমুহূর্তে মূলাবস্থায় প্রকৃতি অচঞ্চল স্থির বলে 'অকম্প-অচল', এবং নিত্য তাই ধ্রুব, সর্ব্বদা বিদ্যমান বলে 'সৎ', সংসারবন্ধনের কারণ হওয়ায় সমস্ত দুঃখের হেতু তাই 'অসৎ'। সকল কিছুকে ব্যাপ্ত করে অবস্থান করায় সর্বব্যাপী, দৃষ্টির গোচর হয়না অর্থাৎ ব্যক্ত হয়না বলে 'অব্যক্ত' এবং সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বলে 'ত্রিগুণ' নামে খ্যাত – 'জ্ঞানদৃষ্টিনিরোধাৎ তমঃ, ... ত্রিগুণাত্মকত্বাৎত্রিগুণঞ্চ'[2] । এই ব্যাখ্যা থেকে বিষয়টি পরিষ্কৃত হয় যে নামরূপে ব্যবহৃত উপরোক্ত প্রতিটি শব্দ প্রকৃতি-স্বরূপ প্রতিপাদক। আর সেই কারণেই বিবিধ নামকরণের কারণ অন্বেষণের মধ্য দিয়ে মহাভারতীয় দৃষ্টিতে সাংখ্যীয়-প্রকৃতির আপাত একটি পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাভারতে প্রকৃতির পর্যায় শব্দসমূহের বিবরণ থেকে নিশ্চিত হয় যে প্রকৃতিতত্ত্বই অব্যক্ততত্ত্ব। তাছাড়া মহাভারতে একাধিকবার এই কথার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন দ্বাদশ অধ্যায়ে মহর্ষি কপিল শিষ্য আসুরির

নিকট প্রকৃতির ধর্ম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন ধান্য প্রভৃতি বীজের যেমন অঙ্কুর প্রভৃতি উৎপাদন ধর্ম, প্রকৃতিরও তেমনি মহদাদি উৎপাদন করা ধর্ম। অর্থাৎ এখানে প্রকৃতির প্রসবধর্মিতার কথা বলা হয়েছে। যাই হোক উক্ত শ্লোকস্থিত 'অব্যক্ত' পদটি যে প্রকৃতি নামক পদার্থকেই বোঝায় সে কথা হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর ভারতকৌমুদীতে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন – 'প্রকৃতিধর্ম্মানাহ অব্যক্তমিতি। অব্যক্তং প্রকৃতিং নাম পদার্থম্'।[3] আরো দেখা যায় শান্তিপর্বে মহামতি ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সাংখ্যতত্ত্বসমূহের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে, প্রকৃতিবাদী সাংখ্যাচার্যরা মূল প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলেন – অব্যক্তমাহুঃ প্রকৃতিং পরাং প্রকৃতিবাদীনঃ'[4] । প্রকৃতিতত্ত্ব ও অব্যক্ততত্ত্ব যে অভিন্ন সেকথা ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্যকারিকায় আলাদা করে কোথাও উল্লেখ করেননি, কিন্তু 'প্রকৃতি', 'প্রধান', 'অব্যক্ত' প্রভৃতি শব্দগুলোকে যেভাবে ব্যবহার করেছেন তা থেকেই তাদের অভিন্নতা অনায়াসে প্রতিপন্ন হয়ে যায়। তবে কারিকায় পর্যায়শব্দের কোনো উল্লেখ না থাকলেও সাংখ্যকারিকার টীকা, ভাষ্য থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন বাচস্পতি মিশ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'প্রধান' – 'প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ প্রধানম্।[5] আবার গৌড়পাদভাষ্যে 'অব্যক্ত' শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'প্রধান' – 'অব্যক্তং প্রধানং'[6] । অতএব 'প্রকৃতি', 'প্রধান' ও 'অব্যক্ত' যে সম অর্থ প্রতিপাদক তথা পর্যায় শব্দ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই প্রসঙ্গে আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষুর বক্তব্যটি বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। বিজ্ঞানভিক্ষু তার সাংখ্যসার গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে বলেছেন – প্রকৃতি, শক্তি, অজা, প্রধান, অব্যক্ত, তমঃ, মায়া, অবিদ্যা প্রভৃতি হল প্রকৃতির পর্যায়শব্দ – 'প্রকৃতিঃ শক্তিরজা প্রধানমব্যক্তং তমো মায়াহবিদ্যেত্যাদয়ঃ প্রকৃতেঃ পর্য্যায়াঃ'[7] । মহাভারতে জগতোৎপত্তিতে প্রকৃতির ক্রিয়া ও ভূমিকা অনুসারে এবং তার স্বভাব-ধর্মের ভিত্তিতে বহুবিধ নামকরণ করা হলেও সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হল কোষ-গ্রন্থ বিধৃত 'প্রধান' ও 'অব্যক্ত' শব্দদুটি। সাংখ্যকারিকাতেও প্রকৃতির নামান্তররূপে সুপ্রসিদ্ধ 'অব্যক্ত' ও 'প্রধান' শব্দেরই উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুই প্রসিদ্ধ শব্দ ব্যতীত অন্যান্য শব্দের ব্যবহার মহাভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করা, অতএব প্রকৃতির পর্যায়শব্দ ব্যবহারের বিষয়ে মহাভারত ও সাংখ্যকারিকার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

সাংখ্যমতানুসারী সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে প্রকৃতিতত্ত্ব। পুরুষ ব্যতীত মহদাদি অন্যান্য তেইশটি তত্ত্ব পর্যায়ক্রমে প্রকৃতি থেকেই উদ্ভুত হয় আবার প্রকৃতিতেই লয় প্রাপ্ত হয়। মহাভারতে প্রকৃতির সেই প্রাধান্য ঘোষণা করতে তাকে তত্ত্বসমূহের পরমেশ্বরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে – 'বিদ্যা প্রকৃতিরব্যক্তং তত্ত্বানাং পরমেশ্বরী'[8]। এই পরমেশ্বরী প্রকৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে তাকে ত্রিগুণময়ী রূপে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই যে প্রকৃতি সে কথাও মহাভারতে সুস্পষ্টভাবে শান্তিপর্বে বলা হয়েছে যথা – 'যদ্বৈ প্রোক্তং গুণসাম্যং প্রধানং'[9]। প্রকৃতির গুণময়তা নিয়ে আরো বলা হয়েছে যে প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা বলেই সে গুণগুলিকে অতিক্রম করতে না পেরে গুণত্রয়কে আশ্রয় করেই অবস্থান করে থাকে – 'গুণস্বভাবস্তুব্যক্তো গুণানেবাভিবর্ততে'[10]। সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রকৃতির প্রত্যক্ষ কোন লক্ষণ প্রদান না করলেও ত্রিগুণাত্মকত্ব যে প্রকৃতির স্বরূপ-ধর্ম সে কথা কারিকায় সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন –

ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্মী।
ব্যক্তং তথা প্রধানম...।।[11]

তত্ত্বকৌমুদীতে বাচস্পতিমিশ্র প্রকৃতির সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন এবং তার মতে সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই হল প্রকৃতি – 'প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ প্রধানম্, সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা'[12]। তাঁর এই মত অবশ্যই

মহর্ষি কপিলের সাংখ্যসূত্র অনুগামী – 'সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ'[13] । অতএব ত্রিগুণাত্মিক প্রকৃতি-লক্ষণ বিষয়ে মহাভারত ও কারিকা গ্রন্থের পারস্পরিক মতামতের মধ্যে যে কোন বিরোধ নেই সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায়।

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির লক্ষণ আলোচনা প্রসঙ্গে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই আবশ্যিক হয়ে পড়ে। তাই এখানে অত্যন্ত অল্প পরিসরে সত্ত্ব, রজো ও তমো গুণ সম্পর্কে মহাভারত ও কারিকা গ্রন্থের বক্তব্যের উপর সামান্য আলোকপাত করা হল। আমরা দেখি উপনিষদে প্রকৃতিকে রক্ত, শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণবিশিষ্ট রূপে উল্লেখ করা হয়েছে – 'অজামেকাং লোহিতশুক্লাকৃষ্ণাম্'[14]। এই বর্ণত্রয় যে যথাক্রমে প্রকৃতি-সন্নিবিষ্ট সত্ত্ব, রজো ও তমো গুণেও বিদ্যমান সেকথা মহাভারতেও বলা হয়েছে। শান্তিপর্বে বশিষ্ঠ-করাল সংবাদে মহর্ষি বশিষ্ঠের মুখে শুনতে পাই যে সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণে যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণ এই তিনটি বর্ণ আছে। ওই গুণগুলিরও সেই সেই রূপ আছে –

শুক্ললোহিতকৃষ্ণাণি রূপাণ্যেতানি ত্রীণি তু।
সর্বাণ্যেতানি রূপাণি যানীহ প্রাকৃতানি বৈ।।[15]

গুণ সম্পর্কিত মহাভারতের অনুরূপ উক্তি আমরা পাই সাংখ্যকারিকা গ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ টীকা তত্ত্বকৌমুদীর মঙ্গলাচরণ শ্লোকে। বাচস্পতিমিশ্রকৃত শ্রৌত মন্ত্রাশ্রিত শ্লোকটি হল –

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নমামঃ।
অজা যে তাং জুষমাণাং ভজন্তে জহত্যেনাং ভুক্তভোগাং নুমস্তান্।।[16]

এখানে বিবিধ কর্মের জননী সত্ত্ব-রজঃ-তমো গুণাত্মিকা এক অজা অর্থাৎ মূল প্রকৃতিকে নমস্কার জানানো হয়েছে। অতএব সাংখ্যকারিকা ও মহাভারত উভয়ত্রই প্রকৃতির তথা গুণসমূহের এই প্রকার বর্ণসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

মহাভারতে গুণের স্বরূপ ও কার্য সম্পর্কিত বক্তব্য কারিকা গ্রন্থের বক্তব্যের সমতুল প্রায়। ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় গুণসমূহের স্বরূপ প্রতিপাদন করে বলেছেন সত্ত্বাদি গুণ হল প্রীতি, অপ্রীতি ও বিষাদাত্মক – 'প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ'[17]। তিনি কারিকায় গুণানুযায়ী স্বরূপের বিষয়টি পরিষ্কার করেননি। বাচস্পতিমিশ্র তত্ত্বকৌমুদীতে এই ব্যাপারে সংশয়মুক্ত করে স্পষ্টভাবে বলেছেন সত্ত্বগুণ প্রীত্যাত্মক তথা সুখাত্মক, রজোগুণ অপ্রীত্যাত্মক তথা দুখাত্মক এবং তমোগুণ বিষাদাত্মক তথা মোহাত্মক – 'প্রীতিঃ সুখম্, প্রীত্যাত্মকঃ সত্ত্বগুণ। অপ্রীতিঃ দুখম্, অপ্রীত্যাত্মকো রজোগুণঃ। বিষাদ-মোহঃ, বিষাদাত্মকস্তমোগুণ ইত্যর্থঃ।'[18] অর্থাৎ জীব তার দেহ ও মনে প্রকৃতির সত্ত্বগুণজনিত সুখ, রজোগুণজনিত দুঃখ ও তমোগুণজনিত মোহাচ্ছন্নতা অনুভব করে। এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে বিজ্ঞানভিক্ষু সত্ত্ব প্রভৃতি গুণের সুখ প্রভৃতি ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে সুখ ব্যতিরেকেও সত্ত্বগুণের প্রীতি, তিতিক্ষাদি, রজোগুণের শোকাদি এবং তমোগুণের নিদ্রা, আলস্য প্রভৃতি ধর্ম আছে। কিন্তু যেহেতু সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের যথাক্রমে সুখ, দুঃখ ও মোহই প্রধান ধর্ম তাই সংক্ষেপে সত্ত্ব সুখাত্মক, রজো দুখাত্মক এবং তমো মোহাত্মক বলা হয়ে থাকে। সুখাদি অনুভুতি সবই সত্ত্বাদি গুণের কার্য একথা মহাভারতেও একাধিকবার বলা হয়েছে। যেমন শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে ভীষ্ম জানিয়েছেন যে দেহ ও মনে যা প্রীতিসংযুক্ত হয় তা

সাত্ত্বিকভাবের কার্য, যা নিজের দুঃখযুক্ত ও অপ্রীতিকর হয় তা রজোগুণের কার্য এবং যা দেহ ও মনকে মোহমুক্ত করে এবং তাতে অনির্বচনীয় ও অজ্ঞেয় ভাব সঞ্জাত করে তা তমোগুণের কার্য –

অত্র যৎ প্রীতিসংযুক্তং কায়ে মনসি বা ভবেৎ।
বর্ত্ততে সাত্ত্বিকো ভাব ইত্যুপেক্ষেত তত্তথা।।
অথ যদ্দুঃখসংযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ।
প্রবৃত্তং রজ ইত্যেব তদসংরভ্য চিন্তয়েৎ।।
অথ যন্মোহসংযুক্তং কায়ে মনসি বা ভবেৎ।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ।।[19]

গুণসমূহের কার্য বিষয়ে নীলকণ্ঠের ভারতভাবদীপ টীকার বক্তব্যটিও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। সেখানে বলা হয়েছে সত্ত্বগুণ হতে দয়া প্রভৃতি, রজো থেকে আসক্তি বা কাম প্রভৃতি এবং তমো গুণ থেকে মোহ প্রভৃতি ধর্ম উৎপন্ন হয়ে থাকে – 'সত্ত্বস্য গুণাম্ ধর্ম্মাদীন্ রজসঃ প্রবৃত্ত্যাদীন্ তমসোঽপ্রবৃত্যাদীন্...'।[20]

কোনো কার্য সাধনের ক্ষেত্রে সত্ত্বাদি গুণত্রয় যেরূপ ভূমিকা পালন করে থাকে তার উপর ভিত্তি করে সাংখ্যশাস্ত্রে গুণগুলির চরিত্র নিরূপণ করা হয়েছে। এবিষয়ে ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় বলেছেন সত্ত্বগুণ হল লঘু ও প্রকাশক, রজোগুণ প্রবৃত্তিশীল ও চঞ্চল অর্থাৎ ক্রিয়াশীল এবং তমোগুণ গুরু ও আবরণক –

সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলং চ রজঃ।
গুরু বরণকমেবতমঃ ...।।[21]

সাংখ্যকারিকার এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে নীলকণ্ঠের টীকায় – 'তামসান্ ক্রোধাদীন্, রাজসান্ প্রবৃত্ত্যাদীন্, সাত্ত্বিকান্ প্রকাশাদীন্'[22]। তাছাড়াও নীলকণ্ঠ ভারতভাবদীপে সত্ত্ব, রজো ও তমো গুণের শুক্ল, লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ ধারণের হেতুরূপে স্বচ্ছত্ব, রঞ্জকত্ব ও মলিনত্বকে উল্লেখ করেছেন যা পক্ষান্তরে সত্ত্বাদি গুণের যথাক্রমে প্রকাশত্ব, ক্রীয়াশীলত্ব ও আবরকত্ব ধর্মকেই নির্দেশ করে – 'ক্রমেণ স্বচ্ছত্বাদ্রঞ্জকত্বান্মলিন্ত্বাচ্চ সত্ত্বাদীনি শুক্ললোহিতকৃষ্ণানি...'[23]। অতএব উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে গুণের স্বরূপ, ধর্ম ও কার্য বিষয়ক বক্তব্যে মহাভারত ও সাংখ্যকারিকার মধ্যে কোন বৈসাদৃশ্য নেই।

ত্রিগুণাত্মিকা এই প্রকৃতি তত্ত্বই যে অব্যক্ত তত্ত্ব একথা প্রকৃতির পর্যায়শব্দ আলোচনার প্রসঙ্গে পূর্বেই বলা হয়েছে। ব্যক্ত তত্ত্ব হল প্রকৃতি ও পুরুষ ব্যতীত মহদাদি তেইশটি বিকারযুক্ত পদার্থ – 'তত্র ব্যক্তলক্ষণমাহ প্রোক্তমিতি। তচ্চ মহদাদি বিকারান্তং ত্রয়োবিংশকম্'[24]। মহাভারতে বলা হয়েছে অব্যক্ততত্ত্বের স্বরূপ অবগত হওয়ার পূর্বে ব্যক্ততত্ত্বকে জানা প্রয়োজন কারণ তাতে অব্যক্ত সহজবোধ্য হয়ে ওঠে –

'তত্রাব্যক্তময়ী বিদ্যাং শৃণু ত্বং বিস্তরেণ মে।
তথা ব্যক্তময়ঞ্চৈব সাংখ্যে পূর্ব্বং নিবোধ মে।।[25]

ব্যক্তের যা ধর্ম অব্যক্ত তার বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট। ব্যক্তের ধর্ম নির্দেশ করে মহাভারতে বলা হয়েছে ব্যক্ত হল জন্ম, বৃদ্ধি, জরা ও মরণ এই চারটি লক্ষণযুক্ত –

প্রোক্তং তদব্যক্তমিত্যেব জায়তে বর্দ্ধতে চ যৎ।
জীর্য্যতে ম্রিয়তে চৈব চতুর্ভিলক্ষণৈর্যুতম্।।[26]

কিন্তু অব্যক্ত প্রকৃতি হল জন্মাদি রহিত অনাদি নিত্য পদার্থ। অনাদি নিত্য হওয়ায় তার জন্ম ও পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি, জরা ও মরণ সম্ভব নয়। তাই মহাভারতে বলা হল যা ব্যক্তধর্মের বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট তাই অব্যক্ত – 'বিপরীতমতো যত্তু তদব্যক্তমুদাহৃতম্'[27]।

সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বরকৃষ্ণও অব্যক্তের স্বরূপ প্রতিপাদন করেছেন ব্যক্তের বিপরীত ক্রমে। ব্যক্তের ধর্ম উল্লেখ পূর্বক অব্যক্তকে সেই সকল ব্যক্তধর্মের বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট বলেছেন –

হেতুমদনিত্যমব্যাপিসক্রিয়মনেকাশ্রিতং লিঙ্গম্।
সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তম্।।[28]

অর্থাৎ ব্যক্ত হেতুবিশিষ্ট, অনিত্য, অব্যাপী, সক্রিয়, অনেক, আশ্রিত, লিঙ্গ, সাবয়ব, পরতন্ত্র এবং অব্যক্ত এগুলির বিপরীত হওয়ায় অহেতুমৎ, নিত্য, সর্বব্যাপী, নিষ্ক্রিয়, এক, অনাশ্রিত, অলিঙ্গ, নিরবয়ব ও স্বতন্ত্র। তবে অব্যক্ত কেবলমাত্র ব্যক্তের বিপরীত ধর্ম বিশিষ্ট নয় সাধর্ম্যযুক্তও বটে। সেক্ষেত্রে অব্যক্ত ব্যক্তের ন্যায় ত্রিগুণাত্মিকা, অবিবেকী, বিষয়, সামান্য, অচেতন, প্রসবধর্ম্মী এবং পুরুষ হল ত্রিগুণাদি ধর্মের বিপরীত ধর্মযুক্ত –

ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানম্, তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্।।[29]

অবশ্য এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অব্যক্ত প্রকৃতি কিন্তু পুরুষের ন্যায় অনাদি, নিত্য ও অবিনাশী। একথা বাচস্পতিমিশ্র তত্ত্বকৌমুদীতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন – 'অহেতুমত্ত্বনিত্যত্বাদি প্রধানসাধর্ম্যমস্তি পুরুষস্য'[30]।

অব্যক্ত প্রকৃতি সম্পর্কে মহাভারতের বক্তব্যও অনুরূপ। সাংখ্যে প্রকৃতি অচেতন। মহাভারতে এই অচেতন প্রকৃতির পরিচয় আমরা পাই শান্তিপর্বে – 'অচেতনা চৈব মতা প্রকৃতিশ্চাপি পার্থিব'[31]। প্রকৃতি যে পুরুষের ন্যায় অনাদি, নিত্য ও অবিনাশী এ বিষয়েও মহাভারত সাংখ্যকেই অনুসরণ করে বলেছে –

অনাদিনিধনাবেতাবুভাবেব মহামুনে।
অমূর্তিমন্তাবচলাবপ্রকম্প্যগুণাগুণৌ।।[32]

এছাড়া সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতির একত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। সাংখ্যকার ঈশ্বরকৃষ্ণ এবিষয়ে ব্যক্তের বিপরীতক্রমে অব্যক্ত প্রকৃতিকে এক বলে উল্লেখ করেছেন তা পূর্বেই বলা হয়েছে। গৌড়পাদভাষ্যে বলা হয়েছে ব্যক্ত অনেক কিন্তু প্রধান সকলের কারণ বলে এক প্রধানই ত্রিলোকের একমাত্র কারণ – 'তথা অনেকং ব্যক্তমেকং প্রধানং কারণত্বৎ। ত্রয়াণাং লোকানাং প্রধানমেকং কারণং তস্মাদেকং প্রধানম্'[33]। মহাভারতে এবিষয়েও একই কথা বলা হয়েছে তবে সামান্য বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কারণ সেখানে বলা হয়েছে প্রলয়কালে প্রকৃতি এক কিন্তু সৃষ্টিকালে প্রকৃতি বহু – 'একত্বং প্রলয়ে চাস্য বহুত্ব চ যদাসৃজৎ'[34]।

সাংখ্যদর্শনে জগৎ সৃষ্টিতে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ স্বীকার করা হয়েছে। সাংখ্যকারিকায় বলা হয়েছে পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের জন্যই প্রকৃতির পুরুষের সঙ্গে অন্ধপঙ্গু ন্যায়ে সংযোগ হয়। ঈশ্বরকৃষ্ণ উপমা সহযোগে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের উপযোগিতা বর্ণনা করেছেন –

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ।।[35]

চক্ষুবিশিষ্ট পঙ্গু পথ চলতে পারে না আবার চলচ্ছক্তি থাকলেও অন্ধ পথ দেখতে পায় না, কিন্তু পঙ্গুকে অন্ধ বহন করলে পঙ্গু অন্ধকে পথ চলার নির্দেশ দিতে পারে ও এইভাবে উভয়ের সংযোগে একটি বিশেষ কার্য সম্পন্ন হয়। ঠিক তেমনি প্রকৃতি প্রবৃত্তিশীল কিন্তু অচেতন, পুরুষ নিষ্ক্রিয় কিন্তু চেতন। পঙ্গুর ন্যায় চেতন পুরুষ অন্ধের ন্যায় অচেতন প্রকৃতিকে চালিত করে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে পুরুষ এখানে পরিচালন কর্তা নয়। পুরুষের সান্নিধ্যমাত্রেই অচেতন প্রকৃতিতে প্রবৃত্তি ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। ঠিক যেমন চুম্বকের কেবলমাত্র উপস্থিতিতেই লোহার স্বতঃ প্রবৃত্তি বা চলচ্ছক্তি উৎপন্ন হয়। অদৃষ্টাধীন পুরুষের সান্নিধ্যবশত প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ভগ্ন হয় এবং প্রকৃতি কর্মোন্মুখী হয়ে ওঠে ফলে প্রকৃতি মহদাদিতত্ত্ব রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। নিষ্ক্রিয় পুরুষ কর্তারূপে কোন কার্য করে না। অতএব রজোমতী প্রকৃতিই জগৎসৃষ্টিরূপ কার্য করে থাকে এবং এবিষয়ে সে কারো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না ও কারও সাহায্যও অপেক্ষা করে না। এক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র।

জগতোৎপত্তিতে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ মহাভারত স্বীকার করে নিয়েছে কিন্তু কারিকা প্রতিপাদিত সাংখ্যদর্শনে নিত্য, অজা, অব্যক্ত প্রকৃতিতত্ত্ব থেকে তত্ত্বান্তরের উৎপত্তিতে অন্য কোন পরাশক্তি অপেক্ষিত নয়, এবিষয়ে মহাভারতীয় সাংখ্যের ভাবনা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগই যে জগৎসৃষ্টির কারণ সেকথা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত গীতায় সুস্পষ্টভাবে উক্ত হয়েছে। গীতায় বলা হয়েছে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হেতু স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক জগতের সৃষ্টি হয়েছে –

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিত সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ।।[36]

এখানে ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দে 'পুরুষ' ও ক্ষেত্র শব্দে 'প্রকৃতি' বোধব্য। সাংখ্যকারিকায় জগৎসৃষ্টিতে প্রকৃতিকে স্বাধীনরূপে দেখানো হলেও মহাভারতে প্রকৃতির পরতন্ত্রতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যেমন গীতায় বলা হয়েছে ঈশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিত হয়েই প্রকৃতি জগৎ রচনা করেন অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয়ের ক্ষেত্রে প্রকৃতি ঈশ্বর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে –

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্।।[37]

এই শ্লোকদ্বয়ে প্রকৃতির উপর ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ সহজভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন যে কল্পের শেষে অর্থাৎ প্রলয়ে সকল ভূত আমার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে এসে বিলীন হয় এবং কল্পের প্রারম্ভে আমি প্রকৃতিকে নিজবশে রেখে নিজ নিজ প্রাক্তন কর্ম অনুসারে জন্মমৃত্যু পরবশ সেই সকল ভূতকে পুনরায় সৃষ্টি করি। সর্বোপরি লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে মহাভারতীয় সাংখ্যে কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষতত্ত্বের উপরে এক পরমতত্ত্বের কথা স্বীকার করা হয়েছে যার অধীন প্রকৃতি-পুরুষ উভয় তত্ত্বই। যেমন দ্বাদশপর্বে বশিষ্ঠ বলছেন – পুরুষ যখন প্রকৃতির সেই কামক্রোধাদি গুণসমূহকে ঘৃণিত বলে নিন্দা করেন এবং সর্বদর্শী পরমাত্মাকে দেখতে পান তখন পরমাত্মাকে দেখে তাঁকে আর ত্যাগ করেন না। এখানে 'পরং' শব্দে টীকায় পরমাত্মাকেই বোঝানো হয়েছে – 'সর্বদর্শিনং পরং পরমাত্মানং পশ্যতে পশ্যতি'[38]।

উপরোক্ত আলোচনা শেষে আমরা বলতে পারি যে মহাভারতীয় সাংখ্যমতের সঙ্গে সাংখ্যকারিকায় প্রতিফলিত সাংখ্যমতের বিস্তর কোন পার্থক্য নেই। পঞ্চবিংশতি তত্ত্বান্তর্গত প্রতিটি তত্ত্বের স্বরূপ ও ধর্ম সম্পর্কে উভয়ক্ষেত্রে কপিল সাংখ্যানুসারী কথাই বলা হয়েছে। তবে কারিকা সাংখ্যে ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রকৃতি-

পুরুষের অতিরিক্ত কোন তত্ত্বের কথা বলেননি। তিনি ঈশ্বর স্বীকার করেন না, কিন্তু মহাভারতে প্রকৃতি-পুরুষের অতিরিক্ত এক পরম তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে যা অধিকাংশ সময় 'ব্রহ্ম' নামে আখ্যাত হয়েছে। অর্থাৎ, এখানে ষড়বিংশতম তত্ত্বের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। মহাভারতের এই সাংখ্যমত বৈদান্তিকভাবনা প্রভাবিত বলা যায়। বেদান্তে জীবাত্মা ও ঈশ্বরাত্মার অতিরিক্ত শুদ্ধ চৈতন্য পরমাত্মার কথা বলা হয়েছে। মহাভারত তার সাংখ্যভাবনায় এই বৈদান্তিকভাবনার মিশ্রন ঘটিয়েছে বলেই মনে হয়।

---

[1] মহাভারত, ৪.৪৭.২৩, পৃ. ২৮৬

[2] ভারতকৌমুদী, মহাভারত, ৪.৪১.২৩-২৪, পৃ. ২৮৬

[3] ভারতকৌমুদী, মহাভারত, ১২.৩১১.৩১, পৃ. ৩৩৫০

[4] মহাভারত, ১২.২৯৮.২৭, পৃ. ৩১৫২

[5] তত্ত্বকৌমুদী, সাংখ্যকারিকা – ৩, পৃ. ৩৬

[6] গৌড়পাদভাষ্য, সাংখ্যকারিকা - ২, পৃ. ১৩

[7] সাংখ্যসার, ৩.২, পৃ. ৪৯

[8] মহাভারত, ১২.২৯৯.৭, পৃ. ৩১৬৩

[9] মহাভারত, ১২.৩৩৯.১৭, পৃ. ১৯৮২ (পুণা সংস্করণ)

[10] মহাভারত, ১২.৩০৩.৩, পৃ. ১৬৭৪ (পুণা সংস্করণ)

[11] সাংখ্যকারিকা - ১১, পৃ. ১১৭

[12] তত্ত্বকৌমুদী, সাংখ্যকারিকা – ৩, পৃ. ৩৬

[13] সাংখ্যসূত্র – ১.৬১, পৃ. ৪৪

[14] শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪.৫, পৃ. ১২৯

[15] মহাভারত, ১২.২৯৫.৪৬, পৃ. ৩১১১

[16] মঙ্গলাচরণ, তত্ত্বকৌমুদী, পৃ. ১

[17] সাংখ্যকারিকা - ১২, পৃ. ১২৯

[18] তত্ত্বকৌমুদী, সাংখ্যকারিকা - ১২, পৃ. ১৩০

[19] মহাভারত, ১২.২৮৭.২৯-৩১, পৃ. ২৯০৮

[20] ভারভাবদীপ, মহাভারত, ১২.২৯৪.৯১, পৃ. ৩০৯১

[21] সাংখ্যকারিকা - ১৩, পৃ. ১৩৫

[22] ভারতভাবদীপ, মহাভারত ১২.২৯৫.৪৫, পৃ. ৩১১১

[23] ভারতভাবদীপ, মহাভারত ১২.২৯৫.৪৬, পৃ. ৩১১১

[24] ভারতভাবদীপ, মহাভারত ১২.২৩৩.৩০, পৃ. ২৩৯৮

[25] মহাভারত, ১২.২৩৩.২৮, পৃ. ২৩৯৭

[26] মহাভারত, ১২.২৩৩.৩০, পৃ. ২৩৯৮

[27] মহাভারত, ১২.২৩৩.৩১, পৃ. ২৩৯৮

[28] সাংখ্যকারিকা - ১০, পৃ. ১১২

[29] সাংখ্যকারিকা - ১০, পৃ ১১৭

[30] তত্ত্বকৌমুদী, সাংখ্যকারিকা - ১১, পৃ. ১২৭

[31] মহাভারত, ১২.৩০২.১২, পৃ. ১৬৭২ (পুণা সংস্করণ)

[32] মহাভারত ১২.৩০২.১৩, পৃ. ১৬৭২ (পুণা সংস্করণ)

[33] গৌড়পাদভাষ্য, সাংখ্যকারিকা - ১০, পৃ. ৪৯-৫০

[34] মহাভারত, ১২.২৯৪.৩৩, পৃ. ১৬৩৫ (পুণা সংস্করণ)

[35] সাংখ্যকারিকা - ২১, পৃ. ১৯৭

[36] ভগবদ্গীতা ১৩.২৬, পৃ. ৪২৩

[37] ভগবদ্গীতা ৯.৭-৮, পৃ. ৩১৪

[38] ভারতকৌমুদী, মহাভারত, ১২.২৯৯.২২, পৃ. ৩১৬৯

পরামৃষ্ট গ্রন্থপঞ্জী:

বাংলা:

১। অযাচক (সম্পা.), কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, কলিকাতা: যোগেন্দু প্রকাশণ, ১৯৯৩।
২। গোস্বামী, নারায়ণ চন্দ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী। কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৬।
৩। ঘোষ, জগদীশচন্দ্র (সম্পা.), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। কলকাতা: প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ২০০৮
৪। বন্দোপাধ্যায়, অশোককুমার, সাংখ্যকারিকা (গৌড়পদভাষ্য সহ)। কলকাতা: সদেশ, ১৪১৪।
৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার (সম্পা.), সাংখ্য-সারঃ। কলকাতা: সদেশ, ১৪১৩।
৬। সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পা. ও অনু.), মহাভারত খণ্ড ৩৫। কলিকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৪০০।
৭। সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পা. ও অনু.), মহাভারত খণ্ড ৩৬। কলিকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৪০০।
৮। সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পা. ও অনু.), মহাভারত খণ্ড ৩৭। কলিকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৪০০।

সংস্কৃত:

১। Belvalkar, S. K. (Ed.), *Mahābhārata, Śāntiparvana, Mokşadharma Sub-section [Part A]*. Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1951.
২। Belvalkar, S. K. (Ed.), *Mahābhārata, Śāntiparvana, Mokşadharma Sub-section [Part B]*. Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1954.
৩। ভট্টাচার্য, রামশঙ্কর (সম্পা.), সাংখ্যসূত্রম্ (বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য সহ)। বারাণসী: ভারতীয় বিদ্যা প্রকাশন, ২০২২ (বি. স.)